International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 161-167
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.279

দুঃখতত্ত্ব: সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে মানবজীবনের বিশ্লেষণ

বিশ্বজিৎ পাসমান

গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, দর্শন বিভাগ, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sāṃkhya philosophy is one of the branches of the six orthodox schools of Indian philosophy. It is an ancient and fundamental philosophy, founded by the sage Kapila. In Sāṃkhya philosophy, the deepest question of life is the source of suffering (duḥkha) and the path to liberation (moksha) from it. This philosophy analyzes in detail the cause of suffering (duḥkha) and the means of liberation (moksha). The main objective of Sāṃkhya philosophy is to make people understand the nature of suffering (duḥkha) and to show them the path to liberation (moksha) from it.

Sāṃkhya philosophy is a dualistic philosophy, which discusses the difference and relationship between Prakṛti (the material world) and Puruṣa (consciousness or the self). The first verse of the Sāṃkhya kārikā mentions this: "Duḥkhatrābhighātājjijñāsā tadapaghātakē hētau" – meaning, due to the affliction of the threefold suffering (duḥkha), there arises an inquiry into the means of its removal (i.e., the method taught in Sāṃkhya philosophy). Suffering (duḥkha) is a natural part of human life, which is the result of the regular functioning of nature. From birth to death, we encounter various kinds of suffering (duḥkha) – physical, mental, and environmental. However, this suffering (duḥkha) is not permanent; liberation from suffering (duḥkha) is possible through right knowledge and consciousness. In this essay, we will analyze various aspects of the theory of suffering (duḥkha) in Sāṃkhya philosophy – the source of suffering (duḥkha), its types, its impact on human life, and the path to liberation. Additionally, it will be discussed how this philosophy remains relevant in modern life.

Keywords: Suffering, Liberation, Discipline, Self-conscious, Prakṛti, Puruṣa, Spiritual Development

ভূমিকা:

মানবজীবন মূলত সুখ ও দুঃখের সমন্বয়ে গঠিত। মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক সমস্যা হল দুঃখ। জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, বিচ্ছেদ, আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণতা— এই সমস্ত অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনে দুঃখের সৃষ্টি করে। সাংখ্যকারিকা সংস্কৃত ভাষায় সূত্রাকারে রচিত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃত ভাষায় অনেক টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি রচিত হয়েছে। যেমন— বাচস্পতি মিশ্র রচিত টীকা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, গৌড়পাদ রচিত ভাষ্য গৌড়পাদভাষ্য, মাঠর রচিত বৃত্তি মাঠরবৃত্তি, অজানা লেখক রচিত টীকা যুক্তিদীপিকা ইত্যাদি। এই প্রতিটি টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি সাংখ্যকারিকা-গ্রন্থের স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থাপন করে। উপরিউক্ত সমস্ত টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তিগুলির মধ্যে নানান বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ঐ টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তিগুলি পাঠ করলে সূত্রগ্রন্থে বর্ণিত

বিষয়গুলি সম্বন্ধে বা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি যৌক্তিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারণা গঠন করা সম্ভব। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সব শাখাই দুঃখকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং এই দুঃখ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ভারতীয় দর্শনের মূল প্রেরণা। ভারতীয় দর্শন জগতে বিদ্যমান ছয়টি আস্তিক দর্শন-প্রস্থানের অন্যতম হল সাংখ্য দর্শন। সাংখ্যের মূল প্রবক্তা হলেন পরমর্ষি কপিল। সাংখ্য দর্শনের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ হল 'সাংখ্যকারিকা'। সাংখ্য দর্শনের মূল তত্ত্ব হলো প্রকৃতি ও পুরুষ, এবং এ কারণে সাংখ্য দর্শনকেদ্বৈতবাদীদর্শন বলা হয়। প্রকৃতি হলো জড় জগতের মূল উৎস, যা ত্রিগুণ— সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ— দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। সত্ত্ব গুণ শুদ্ধতা, জ্ঞান ও শান্তির প্রতীক; রজঃ গুণ ক্রিয়াশীলতা, আকাঙ্ক্ষা ও অস্থিরতার প্রতীক; এবং তমঃ গুণ জড়তা, অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের প্রতীক।[১] এই ত্রিগুণের সংমিশ্রণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত বস্তু, ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, পুরুষ হলো বিশুদ্ধ চৈতন্য; পুরুষ কোনো কর্মে জড়িত নয় এবং সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয়। প্রকৃতি ও পুরুষের এই সম্পর্কের অসামঞ্জস্যই দুঃখের মূল কারণ। আমরা সকলেই এবিষয়ে অবগত যে, মানুষের জীবনে সবচেয়ে কষ্টকর অনুভূতি হল দুঃখের অনুভূতি। এই দুঃখানুভূতির জন্যই মানুষ দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে অর্থাৎ মানুষের মনে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগে। সাংখ্যকারিকায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে,"প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ, পুরুষ তার উদ্দেশ্য।" যখন পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অভিন্ন ভাবতে শুরু করে, তখন সে শরীর, মন এবং বাহ্যিক জগতের কষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ দুঃখানুভূতি হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা শারীরিক ব্যথা বা মানসিক চাপ অনুভব করি, তখন আমরা ভুলে যাই যে এই কষ্টগুলো প্রকৃতির অংশ, পুরুষ নয়। এই অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাই দুঃখের জন্ম দেয়। সাংখ্য দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো এই ভ্রান্তি দূর করে পুরুষকে তার স্বতন্ত্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।[২]

গুনত্রয়:

সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব; যথা– পুরুষ বা জ্ঞ, অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি বা পৃথিবী, অপ্ বা জল, তেজ বা অগ্নি, মরুৎ বা বায়ু, আকাশ বা ব্যোম্,। এই পঁচিশটি তত্ত্বের জ্ঞান তথা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর ভেদজ্ঞানকেই জীবের সকল দুঃখের চিরনিবৃত্তির উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞানতা এবং ত্রিগুণের প্রভাবই সাংখ্য দর্শনে দুঃখের প্রধান উৎস। এই অজ্ঞানতা হলো পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করার ভ্রান্তি। প্রকৃতির ত্রিগুণ– সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ–মানুষের শরীর ও মনের উপর ক্রমাগত প্রভাব ফেলে। রজঃ গুণ যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ অতিরিক্ত ক্রিয়াশীলতা, আকাঙ্ক্ষা ও অস্থিরতার শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যখন সম্পদ বা ক্ষমতার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এবং তা না পেয়ে হতাশ হয়, তখন এটি রজঃ গুণের প্রভাব। তমঃ গুণ যখন প্রাধান্য পায়, তখন জড়তা, অলসতা এবং মানসিক অন্ধকার দেখা দেয়। সত্ত্ব গুণ যদিও সুখ ও জ্ঞান প্রদান করে, তবুও এটি প্রকৃতির অংশ হওয়ায়অস্থায়ী। উদাহরণস্বরূপ, একজন ছাত্র যখন পরীক্ষায় ভালো ফল করে আনন্দিত হয়, তখন এই সুখ সত্ত্ব গুণের প্রভাবে উদ্ভূত হয়, কিন্তু এটি স্থায়ী নয়; পরবর্তীতে ব্যর্থতার কারণে তার দুঃখ ফিরে আসতে পারে। সাংখ্য দর্শনে বিশ্বাস করা হয়, ত্রিগুণের এই

[১]ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা-১২-১৩

[২]ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা-২১

প্রভাব থেকে মুক্ত না হলে দুঃখের পূর্ণ অবসান সম্ভব নয়। এই অজ্ঞানতা দূর করতে প্রয়োজন বিবেক-জ্ঞান, যা পুরুষকে প্রকৃতির সঙ্গে বিভ্রান্ত না হয়ে তার স্বতন্ত্র স্বরূপে দেখতে শেখায়।

দুঃখের প্রকারভেদ:

ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই জগৎকে দুঃখময় বলে বর্ণনা করেছেন। দুঃখ হল একটি সার্বজনীন সত্য হিসেবে বিবেচিত। ঠিক একথা যেমন সত্য ঠিক তেমনি একথা সত্য যে ভারতীয় দর্শনে দুঃখের প্রসঙ্গ যেমন আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে ঠিক এর বিপরীত দুঃখ-নিবৃত্তির আলোচনাও প্রাধান্য পেয়েছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকা-গ্রন্থের প্রথম কারিকাটি হল–

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ।।"

অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতের ফলে তার নিবৃত্তির উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে সমস্ত জীবকূল ত্রিবিধ দুঃখ-তাপ ভোগ করে। সাংখ্য দর্শনে দুঃখকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে –১) আধিভৌতিক, ২) আধিদৈবিক এবং ৩) আধ্যাত্মিক। এই ত্রিবিধ গুন একটি ছকের সাহায্যে নিম্নে দেখানো দেওয়া হল–

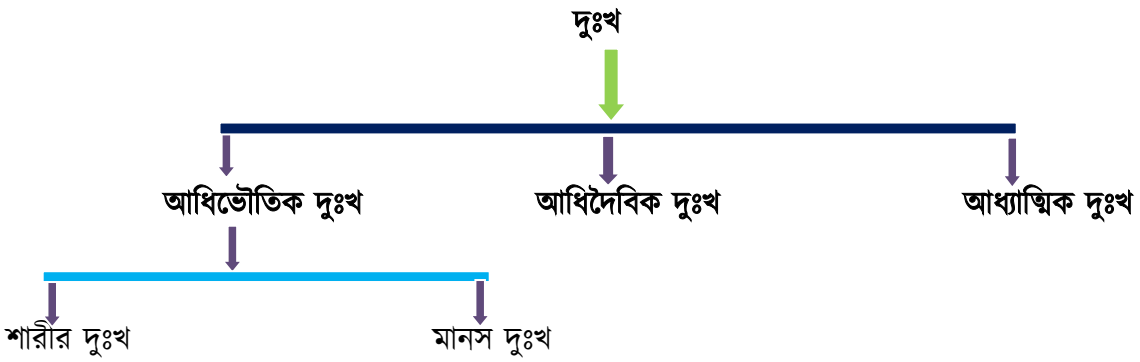

আধিভৌতিক দুঃখ হলো শারীরিক ও বাহ্যিক কারণে উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ, শরীরের রোগ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা পরিবেশগত সমস্যা যেমন গরম-ঠান্ডা। আধিদৈবিক দুঃখ হলো প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃত কারণে সৃষ্ট, যেমন—ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক দুঃখ হলো মানসিক ও অভ্যন্তরীণ ধরনের, যেমন—ভয়, দুশ্চিন্তা, হতাশা।এই তিন প্রকার দুঃখ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উপস্থিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শ্রমিক যখন কঠোর পরিশ্রমের পরও দারিদ্র্যের সম্মুখীনহয়, তখন তার শারীরিক কষ্ট আধিভৌতিক দুঃখ। একই সময়ে, যদি বন্যায় তার ঘর ভেসে যায়, তবে এটি আধিদৈবিক দুঃখ। তার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা আধ্যাত্মিক দুঃখ।সাংখ্য দর্শনের মতে, এই দুঃখগুলো প্রকৃতির ত্রিগুণের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফল। এগুলো এড়ানো যায় না, তবে সঠিক জ্ঞান ও চেতনার মাধ্যমে এর প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। নিম্নে ত্রিবিধ দুঃখের ব্যখ্যা করা হল—

আধিভৌতিক দুঃখ:

আধিভৌতিক দুঃখ হল মানুষ, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরাদি থেকে উৎপন্ন দুঃখকে বলা হয় আধিভৌতিক দুঃখ। "আধিভৌতিকং মানুষপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরনিমিত্তম্"।[৩] শারীরিক ও বাহ্যিক বাহ্য উপায় সাধ্য। এটি প্রকৃতির ত্রিগুণের ভারসাম্যহীনতার ফল। শরীরের রোগ, আঘাত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং

[৩] তদেব

পরিবেশগত সমস্যা যেমন গরম, ঠান্ডা বা দূষণ—এগুলোই আধিভৌতিক দুঃখের উদাহরণ। উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃষক দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের পর শরীরে ব্যথা অনুভব করলে, এটি তার শরীরের সঙ্গে পুরুষের ভ্রান্ত সম্পর্কের ফল। এই দুঃখ শুধু শারীরিক নয়, বরং বাহ্যিক পরিস্থিতির সঙ্গেও জড়িত। যেমন, একজন গৃহহীন ব্যক্তি শীতে কষ্ট পায় বা একটি শিশু ক্ষুধায়কাঁদে। সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী, এই কষ্টগুলো প্রকৃতির জড় উপাদানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফল। যেহেতু শরীর প্রকৃতির অংশ, তাই এটি দুঃখের অধীন, কিন্তু পুরুষ বা আত্মা এই দুঃখ থেকে মুক্ত। এই জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ শারীরিক কষ্টের প্রভাব কমাতে পারে।

আধিদৈবিক দুঃখ:

আধিদৈবিক দুঃখ হল যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক এবং গ্রহাদির সংস্থান থেকে উৎপন্ন যে দুঃখ তাকে বলে আধিদৈবিক দুঃখ। "আধিদৈবিকং তু যক্ষরাক্ষসবিনায়কগ্রহাদ্যাবেশনিবন্ধনম্"।[৪] প্রকৃতির বৃহৎ শক্তি বা অতিপ্রাকৃত কারণে সৃষ্ট কষ্ট, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। উদাহরণস্বরূপ, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় বা খরা—এগুলো আধিদৈবিক দুঃখের প্রকাশ। একটি গ্রাম যখন বন্যায়ধ্বংস হয়ে যায় বা একটি পরিবার ভূমিকম্পে সব হারায়, তখন এটি প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য শক্তির ফল। সাংখ্য দর্শনের মতে, এই দুঃখও ত্রিগুণের ক্রিয়ার অংশ। প্রকৃতির তমঃ গুণ যখন প্রবল হয়, তখন ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রজঃ গুণের প্রভাবে প্রকৃতির গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের রূপ নিতে পারে। এই দুঃখ মানুষকে অসহায় করে তোলে, তবে সাংখ্য মতে এটি পুরুষ বা আত্মাকে স্পর্শ করে না। জ্ঞানের মাধ্যমে এই দুঃখের প্রতি উদাসীনতা অর্জন করা সম্ভব।

আধ্যাত্মিক দুঃখ:

আধ্যাত্মিক দুঃখ হল জিজ্ঞাসুর নিজের শরীর ও মন থেকে জাত দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। "তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং, শারীরং মানসঞ্চ"।[৫] মানসিক ও অভ্যন্তরীণ দুঃখ। এটি মনের কষ্ট, যা ত্রিগুণের প্রভাবে মানসিক অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত হয়। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার তারতম্য হেতু যে দুঃখ জন্মায় তাকে বলা হয় শারীর দুঃখ। এটি আন্তর উপায় সাধ্য। অপরদিকে কাম, ক্রোধ, মোহ, ভয়, লোভ, ঈর্ষা, বিষাদ এবং ইষ্ট তথা অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি হেতু যে দুঃখ জন্মায় তাকে বলা হয় মানস দুঃখ। এটিও আন্তর উপায় সাধ্য। যেমন, ভয়, দুশ্চিন্তা, হতাশা, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি— এগুলি আধ্যাত্মিক দুঃখের উদাহরণ। উদাহরণস্বরূপ, একজন ছাত্র যখন পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ারভয়ে রাতে ঘুমোতে পারে না, তখন এটি তার মনের অস্থিরতার ফলস্বরূপ। আবার, একজন মা যখন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েদুশ্চিন্তায় কষ্ট পান, তখন এটিও আধ্যাত্মিক দুঃখ। আধুনিক জীবনে এই দুঃখ আরও প্রকট। চাকরির চাপ, সম্পর্কের জটিলতা বা সামাজিক প্রতিযোগিতা— এগুলো মানসিক অশান্তির জন্ম দেয়। সাংখ্য দর্শন অনুসারে, এই দুঃখ মনের প্রকৃতির সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোগের ফল। রজোগুণের প্রভাবে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়, তমোগুণের প্রভাবে হতাশা আসে। এই দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য মনকে ত্রিগুণের উর্ধ্বে উন্নীত করতে হবে।

দুঃখের সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতির ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—হলো দুঃখের মূল উৎস।[৬] সত্ত্ব গুণ মানুষের মধ্যে সুখ, জ্ঞান ও শান্তি উদ্রেক করে, তবে এ অনুভূতিগুলো স্থায়ী নয়। রজঃ গুণ ক্রিয়াশীলতা, আকাঙ্ক্ষা

---

[৪] তদেব

[৫] তদেব

[৬]ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা-১৪

ও প্রত্যাশার জন্ম দেয়, যা পূর্ণ না হলে দুঃখে পরিণত হয়। তমঃ গুণ জড়তা, অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যখন অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়, তখন এটি রজঃ থেকে তমঃ গুণে রূপান্তরের ফল। এই ত্রিগুণের প্রভাবই মানুষের জীবনের বহু কর্মকাণ্ড এবং অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, একটি শিশু খেলার সময় সত্ত্ব গুণের কারণে আনন্দ অনুভব করে, কিন্তু খেলনা হারালে রজঃ গুণের কারণে কষ্ট পায়। সাংখ্য দর্শনের মতে, ত্রিগুণের এই ধারাবাহিক প্রভাব থেকে মুক্ত না হলে দুঃখের চূড়ান্ত অবসান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বিবেক-জ্ঞান, যা পুরুষকে ত্রিগুণের সীমারেখার বাইরে নিয়েযায় এবং তার স্বতন্ত্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তিই মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য:

সাংখ্যকারিকা-গ্রন্থটি শুরু হয়েছে জীবের এই ত্রিবিধ দুঃখের অভিভবের তিন প্রকার উপায় দিয়ে। সেগুলি হল— দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়, আনুশ্রবিক উপায় তথা বেদবিদিত যাগযজ্ঞাদি কর্মকলাপ এবং সাংখ্য শাস্ত্র বিহিত উপায়— তত্ত্বজ্ঞান। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হিসাবে দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। কিন্তু আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মতো সহজসাধ্য নয়। অনেক মুহূর্ত, প্রহর, দিন, রাত্রি, মাস এবং বৎসরাদি কাল যাবৎ অনুষ্ঠিতব্য। কিন্তু দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নয় অর্থাৎ সকল দুঃখের নিশ্চিত চিরনিবৃত্তি সম্ভব নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, আনুশ্রবিক উপায়ের দ্বারা দুঃখের চিরনিবৃত্তি সম্ভব কিনা? এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকা-গ্রন্থের দ্বিতীয় কারিকায় বলেছেন—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।"[৭]

অর্থাৎ আনুশ্রবিক বা বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপও দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ের মত ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনে অসমর্থ। এই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ বা আনুশ্রবিক উপায় যেহেতু দৃষ্ট উপায়ের মত অবিশুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয়যুক্ত, সেহেতু যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিপরীত সাংখ্য শাস্ত্র বিহিত উপায় তত্ত্বজ্ঞান বা ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান-ই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়-রূপে নির্দেশিত হয়েছে। কেননা, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা সকল দুঃখের নিশ্চিত চিরনিবৃত্তি সম্ভব। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর ভেদ জ্ঞানই সাংখ্য দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান বলে বিবেচিত হয়েছে।

সাংখ্যমতে লৌকিক বা বৈদিক কোন প্রকার কর্মের দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারাই জীব দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভ করতে পারে। ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি এবং জ্ঞ বা পুরুষের স্বরূপ অনুধাবনের মাধ্যমেই দুঃখের হাত থেকে জীবের চিরনির্বত্তি লাভ হতে পারে। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ–এর এই ভেদজ্ঞানই সাংখ্য দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান বলে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার দ্বিতীয় কারিকায় বলেন–"বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপও লৌকিক উপায়ের মতো ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনে অসমর্থ। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ যেহেতু অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত, সেহেতু যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিপরীত দুঃখ নিবৃত্তির সেই সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপায় ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান–ই শ্রেয়। কারণ ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ–এর বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ও চির নিবৃত্তি হয়।" ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ– এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিভেদ জ্ঞান হলে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক

[৭] সাংখ্যকারিকা-২

নিবৃত্তি সম্ভব হয়। দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হলো দুঃখের অবশ্য নিবৃত্তি এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হলো নিবৃত্ত দুঃখের পুনরায় উৎপত্তি না হওয়া।

তত্ত্বজ্ঞান:

সাংখ্য দর্শনে মুক্তি বলতে বোঝায় পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য তার ভেদ জ্ঞানকে বোঝা। এটি অর্জন সম্ভব বিবেক-জ্ঞানের মাধ্যমে, যা পুরুষকে তার স্বতন্ত্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।[৮] বিবেক-জ্ঞান অর্জনের জন্য ধ্যান ও আত্ম চিন্তন অপরিহার্য। সাংখ্যকারিকায় বলাহয়েছে, "তত্ত্বজ্ঞানেনমোক্ষঃ"[৯]— অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি। ধ্যানের মাধ্যমে মন ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্তি পায় এবং পুরুষ তার স্বতন্ত্র চৈতন্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ায় যোগ দর্শন ও সাংখ্য দর্শনের গভীর সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। পতঞ্জলির যোগসূত্রে ধ্যান ও সমাধির আলোচনা করা হয়েছে, যা সাংখ্য দর্শনের বিবেক-জ্ঞানের ব্যবহারিক রূপ হিসেবে ধরা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাধক ধ্যানে নিজেকে শরীর-মন থেকে পৃথকভাবে দেখার প্রক্রিয়ায় দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। এই অবস্থাকেই কৈবল্য বা মুক্তি বলা হয়।

মানব জীবনে দুঃখ:

দুঃখ মানব জীবনের সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন প্রকার দুঃখের মুখোমুখি হই। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু জন্মের সময়কাঁদে, একজন যুবক প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কষ্ট ভোগে, একজন বৃদ্ধ শারীরিক অসুস্থতায় ভোগে। সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখের উপস্থিতি অনিবার্য। যেমন, একটি পরিবার অর্থনৈতিক সংকটেরসম্মুখীন হলে সেখানে আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখের মিলন ঘটে। সাংখ্য দর্শনের দৃষ্টিতে, দুঃখ জীবনের স্বাভাবিক অংশ হলেও এটি পুরুষ বা আত্মার প্রকৃতি নয়; বরং এটি প্রকৃতির ত্রিগুণের ফল। দুঃখের এই স্বাভাবিকতা মানুষকে জীবনের গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটি আমাদের শেখায় যে বাহ্যিক সুখের পিছনে ছুটে লাভ নেই; প্রকৃত শান্তি আসে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে।

আধুনিক জীবনে সাংখ্য দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক জীবনে সাংখ্য দর্শনের দুঃখ তত্ত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা প্রায়শই চাকরির চাপ, সম্পর্কের জটিলতা বা বস্তুগত আকাঙ্ক্ষার কারণে দুঃখ অনুভব করি। উদাহরণস্বরূপ, একজন কর্মী যখন চাকরি হারানোরভয়েদুশ্চিন্তায় থাকে, এটি আধ্যাত্মিক দুঃখ। আবার, একটি পরিবার যখন দারিদ্র্যের সম্মুখীনহয়, তখন এটি আধিভৌতিক দুঃখের উদাহরণ। সাংখ্য দর্শনের দৃষ্টিতে, এই সমস্ত দুঃখ ত্রিগুণের প্রভাবে উদ্ভূত। সাংখ্য দর্শন আমাদের শেখায় যে সংযম ও জ্ঞানের মাধ্যমে এই দুঃখের মাত্রা কমানো সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপ হ্রাস করা বা বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা আধুনিক জীবনে কার্যকর প্রয়োগযোগ্য। এটি আমাদের মানসিক শান্তি এবং জীবনের গভীর উদ্দেশ্য অন্বেষণে সহায়তা করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এর মিলও রয়েছে, যেখানে মননশীলতা (mindfulness) দুঃখ কমাতে ব্যবহৃত হয়।

সাংখ্য দর্শন দুঃখকে সমস্যা হিসেবে নয়, বরং মুক্তির প্রেরণা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এটি মানব জীবনের দুঃখের গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করে এবং ত্রিবিধ দুঃখের উৎস ও প্রভাব ব্যাখ্যা করে। ত্রিগুণের

---

[৮]ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা-৬৪

[৯]তত্ত্বজ্ঞনাদ্অপুণর্বন্ধঃতত্ত্বজ্ঞানত্মোক্ষঃ

প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এবং বিবেক-জ্ঞানের সাহায্যে আমরা কৈবল্য অর্জন করতে পারি। আধুনিক জীবনে সাংখ্য দর্শন আমাদের বস্তুবাদীদৌড় থেকে বের হয়ে অভ্যন্তরীণ শান্তির পথে পরিচালিত করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. শর্মা, পূর্ণচন্দ্র (২০০৫), পাতঞ্জলদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

২. দিবাকরানন্দ, স্বামী (১৯৭৬),*শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীতা সাংখ্যকারিকা*, প্রকাশক— গণেশ চন্দ্র দত্ত, ৩৪, সদানন্দ রোড,কলকাতা

৩. গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র (১৯৯৪), *শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

৪. ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ (সপ্ততীর্থ) (১৯৮৪), *সাংখ্য দর্শনের বিবরণ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

৫. বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য, পূর্ণচন্দ্র (১৯৮৩), *সাংখ্যকারিকা.* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

৬. ত্রিপাঠি শাস্ত্রি, যদুপতি (১৪১১ বঙ্গাব্দ), *যুক্তিদীপিকা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

৭ ভট্টাচার্য্য, রজত (২০১১), *সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (প্রথম খণ্ড), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা

৮. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথসম্পাদিত (১৯৯৭), সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, বসুমতিসাহিত্যমন্দির, কলিকাতা

৯. ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ (১৯৮৫), সাংখ্যদর্শন, সংস্কৃতকলেজ. কলকাতা

১০. ভাবঘনানন্দ, স্বামী (২০০০), *সাংখ্যকারিকা*, উদ্বোধন কার্যালয়. কলকাতা

১১. ঘটক, পঞ্চানন (২০০০),*সাংখ্য দর্শন*, (প্রথম অংশ),প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

১২. ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ (১৯৮৫), *সাংখ্য দর্শন*, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা

১৩. Chakravarti, Pulinbihari (1975). Origin and Development of the Sāṁkhya System of Thought, 2nd edn. Oriental Books Reprint Corporation. New Delhi

১৪. Sen Gupta, Anima (1959). Classical Sāṁkhya: A critical study. 1st edn. Munshiram Manoharlal Publishers pvt. Ltd. Delhi